কো চেয়ারপার্সন, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ।
গভর্নিং বডি সদস্য, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি।
ডিরেক্টর, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
প্রধান উপদেষ্টা, সুস্থ, সফর, খেলা পত্রিকা।
সম্পাদক, আজকাল শারদ সংখ্যা।
প্রধান সম্পাদক, আজকাল ডট ইন।

পুরস্কার মঞ্চে

মমতা ব্যানার্জী
মমতা বনার্জী
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیر اعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

১৭ মে, ২০২৪

প্রিয় সত্যম,

মৌ-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আগামী রবিবার, ১৯শে মে তোমরা পূজার্চনা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছ, এ কথা জানলাম। সমগ্র আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, এই আশা রাখি। মৌ শুধু তোমার স্ত্রী ছিল না, সে আমাদের সকলের আপনার জন ছিল।

শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে মৌ-এর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সমাজের সেবা করেছে, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। মৌ-এর এই অসময়ে চলে যাওয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনার হলেও আমি জানি, কাজের মধ্যে দিয়ে ও চিরকাল ওর অনুরাগীদের হৃদয়ে থেকে যাবে।

জানি, এ ক্ষতি অপূরণীয়, তবুও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, এই কঠিন সময়ে তিনি তোমাদের মানসিক শক্তি দিন।

মৌ-এর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি; দেবদূত (ঋষি) সহ তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যকে এবং ওর সহকর্মী, প্রিয়জন ও ভালোবাসার মানুষদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

তোমরা সাবধানে থেকো, শরীরের যত্ন নিও।

তোমাদের,
মমতা
(মমতা ব্যানার্জী)

শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী
এফ ই ৪০১, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-৩
কলকাতা – ৭০০ ১০৬

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India
Tel : + 91-33-22145555, + 91-33-22143101
Fax : + 91-33-22144046, + 91-33-22143528

পরিবার

মম দুঃখবেদন, মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী–সম

সত্যম রায়চৌধুরী

পুকুরে ঢিল ছুড়ে গোল গোল বৃত্ত তৈরির খেলা কে না খেলেছে জীবনে! আমিও খেলেছি। কিন্তু সেই বৃত্ত যে জীবন জুড়ে ছড়িয়ে যাবে, কে ভেবেছিল? তখন আমার একুশ বছর। মনে আছে, বড়দির বাড়িতে গৃহপ্রবেশ ছিল। বড়দি টিউশন পড়াত, তাই যে কোনও উপলক্ষে কিশোরীদের ভিড় হত ওর বাড়িতে। সেদিনও তা–ই ছিল। আমরা ক'জন বন্ধু আর কয়েকটি চোদ্দো–পনেরো বছরের উচ্ছল মেয়ে পুকুরধারে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুড়ছিলাম জলে। কার ঢিল কত বড় গোল তৈরি করতে পারে, সেই কম্পিটিশন চলছিল। ওই উত্তেজনার মাঝখানে টের পেলাম, একটু অন্যরকম বুক ঢিপঢিপ, আলাদা শিহরন। ওই যে বড় বড় চোখের ফর্সা মেয়েটা, ও কি আলাদা চাউনি দিচ্ছে আমার দিকে? ভাল লাগার সেই শুরু, টের পেলাম যখন রোজ সন্ধেবেলা পা টানত বারান্দার দিকে। তখন আমি আর দাদা হুগলিতে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার খুলেছি। টেকনো ইন্ডিয়ার যাত্রা শুরু সেখান থেকেই। দু'কামরার সেই বাড়ির সামনে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে টিউশনি থেকে ফিরত মৌ। ওকে একঝলক দেখার ইচ্ছেটা নেশার মতো ঘোরে রাখত সারাদিন। বাপি বলে মৌয়ের এক সম্পর্কিত দাদা ছিল আমার সন্ধের বারান্দার বন্ধু। ওই বয়সে একবার প্রেমে পড়লে সারাক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা। আমার মন বুঝেই একদিন বাপি চ্যালেঞ্জ দিল, 'পারবি না রে, পারবি না। শক্ত জায়গা।' আমি সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিলাম। বাজি হল, যে হারবে সে গোঁফ কেটে ফেলবে। বলা বাহুল্য, বাপিদা হারল। আজ মনে হয়, আমার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কনফিডেন্স ছিল, তা নয়তো সাধের গোঁফ বাজি রাখে কেউ!

তারপর তো ভরপুর অনুরাগ পর্ব। সেই আটের দশকে আজকের মতো হাইটেক প্রেম ছিল না। কোথায় মোবাইল, কোথায় হোয়াটসঅ্যাপ, কোথায় ভিডিও কল? চিঠিই ছিল ভরসা। কম্পিউটার সেন্টারের ছেলেরা একটা মেসে থাকত, সেখানকার বাবলুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। সে বইয়ের ভাঁজে করে চিঠি নিয়ে যেত মৌয়ের কাছে, বাড়িতে ধরা পড়ার ভয়ে মৌ সেসব চিঠি রাখত ওর স্কুলের বন্ধু পাপিয়ার কাছে। পরে এক বিবাহবার্ষিকীতে সাজিয়ে–গুছিয়ে সেসব চিঠি আমাদের উপহার দিয়েছিল বন্ধুরা। সঙ্গে মজার সব ফুটনোট। মৌ চলে যাওয়ার পর বাবলু এল যেদিন, সেই চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেছিলাম। পড়ছিলাম আর চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে আসছিল কত ঘটনা, মান–অভিমান, কান্না–হাসির কত ব্যাকুল প্রকাশ। আহা, এমন ছেলেমানুষির নানা রঙের দিনগুলো কোথায় যে হারিয়ে যায়!

প্রেমের সঙ্গে যে বাইকের কী অসাধারণ সম্পর্ক, সেটা কে না জানে। আমার সেসময় বাইক ছিল। অতএব চান্স পেলেই 'এই পথ যদি না শেষ হয়' স্টাইলে দিল্লি রোড ধরে ছোটা, ধাবায় মৌয়ের প্রিয় ডিম ভুজিয়া আর দুধ চা। আমার আবার ক্যামেরাও ছিল একটা। ফলে পথের মাঝখানে বাইক দাঁড় করিয়ে যখন তখন ফটো তোলা। কখনও আবার লুকিয়ে–চুরিয়ে চন্দননগরের স্টুডিওয় ছবি তুলতে যেতাম। তিন কপি, দু'জনের দুটো আর তৃতীয়টা আমার পার্সে। কারণে–অকারণে পার্স খুলে লোককে দেখানো, আমার আছে এক সুন্দরী প্রেমিকা। এই তো জীবন! আর কী চায় এক মধ্যবিত্ত তরুণ?

একদিন এক কাণ্ড ঘটল। ডিম ভুজিয়া খেয়ে বাইকে স্টার্ট দিয়েছি, জানি মৌ পিছনে বসে আছে। বাড়ি এসে দেখি নেই। আমার তো দিশেহারা অবস্থা। এই যে এত বকবক করতে করতে এলাম সারাটা রাস্তা, মৌ যে জবাব দিচ্ছে না,

খেয়াল করলাম না? নিজের ওপর এত রাগ হল! তবে কি পড়ে গেল বাইক থেকে? প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে চললাম উল্টোপথে। গিয়ে দেখি এক কাপ চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। রেগে কাঁই। ও যে ওঠেইনি বাইকে, সেটা আমি খেয়াল করলাম না? মানভঞ্জন কীভাবে করেছিলাম, সেটা আর বলছি না। তবে আর একপ্লেট ডিম ভুজিয়া খাওয়াতে হয়েছিল।

একটা সময়ের পর আর দর্শনের আশায় পথের ধারে বসে থাকার দরকার পড়ত না। আমি টিউশন পড়াতাম বাড়িতে। মৌ আসত পড়তে। মা খুব ভালবাসত ওকে। বাবা হয়তো বাগান করছেন, মৌ ঢুকলেই মাকে বলতেন, ওই এসে গেছে তোমার মৌমাছি। ছাত্রীর পড়ায় যত না মন, তার থেকে বেশি মন মাস্টারে। মাধ্যমিকে মোটামুটি রেজাল্ট হল। আমি তো ছুতো খুঁজছিলাম। ভাল ঘড়ি কিনে হাজির ছাত্রীর বাড়িতে। ছাত্রী আহ্লাদে আটখানা, কিন্তু মায়ের ভুরু কুঁচকে গেল!

কত কী মনে পড়ছে। আসলে এক জীবনের গল্প বলতে বসলে একটা জীবন সময়ও যেন যথেষ্ট নয়। টুকরো টুকরো স্মৃতির মালা। লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তাই কয়েকটি 'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা'।

গঙ্গার ঘাট, বটতলা, বাদামওয়ালা

বটতলা তো নয়, প্রেমনগর। লোকে ওই নামেই ডাকত চুঁচুড়ার গঙ্গার ঘাটে বটতলাকে। একদিন বসে আছি মৌকে নিয়ে, এক বৃদ্ধ বাদামওয়ালা এসে হাজির। বাদাম তো কিনলাম। কী যে মনে হল, কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস বললাম, কী করলেন সারা জীবন? এই বাদাম বেচেই কাটিয়ে দিলেন? দাদু হতাশ গলায় বলল, কী আর করব বাবা? এভাবেই চলতে হবে। সে যাওয়ামাত্র মৌ ছুড়ে ফেলে দিল বাদামের ঠোঙা। এত রেগে গেছে, এত কষ্ট পেয়েছে বুঝিনি। জলভরা চোখে আমাকে বলল, 'এরকমভাবে বললে তুমি? নিজে কী করো?' সত্যি, তখন আমি টিউশন ছাড়া আর কিছুই করি না। খুব খারাপ লাগল। সেই সঙ্গে ওইটুকু মেয়ের কাছ থেকে বড় শিক্ষা পেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে জেনেবুঝে কাউকে আঘাত করব না। এই ছোট্ট ঘটনা থেকে একটা জেদও চাপল আমার, কিছু করে দেখাতে হবে।

পরিমলের ভেলপুরি

সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে মৌয়ের প্রিয় পরিমলের ভেলপুরি। চুঁচুড়ায় গেলেই মাঠে যাওয়া চাই আর পরিমলের ভেলপুরি খাওয়া চাই। কলকাতাতেও আনাত মাঝে মাঝে। এমন তৃপ্তি তখন চোখেমুখে যেন পৃথিবীর সেরা সুখাদ্য পেয়েছে।

৫ লক্ষের জীবন

একদিন হাঁটতে হাঁটতে মৌকে বললাম, যে করে হোক, পাঁচ লক্ষ টাকা জমাতে হবে। পাঁচ বছরে ডবল হবে, মানে বছরে ধরো এক লাখ টাকা। এটা হলেই কেল্লা ফতে। আমরা দু'জন শুধু দেশ–বিদেশ ঘুরব। ভাবা যায়, টার্গেট ৫ লক্ষ! এখন ভাবলে যে কারও হাসি পাবে। কিন্তু সেই আটের দশকে প্রেমে হাবুডুবু দু'জন কত আকাশকুসুম কল্পনা করত পাঁচ লক্ষ টাকার কথা ভেবে।

রাজধানী মিস

দিল্লি হয়ে যাব শিমলা। রাজধানীর টিকিট কেটেছি। কিন্তু উত্তেজনার বশে হাওড়া, শিয়ালদা ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। আমি আর মৌ বিকেল চারটের ট্রেন ধরব বলে হাওড়া পৌঁছে শুনি, আমাদের টিকিট ছিল শিয়ালদার আর সে ট্রেন ছেড়ে গেছে সকালে। তা বলে কি শিমলা যাব না? কোনও রকমে ম্যানেজ করে সন্ধের কালকা মেলের টিকিট কাটলাম। এসি টু টিয়ার। উঠে দেখি কী মজা! আমরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। এক্সট্রা কোচ জুড়েছে কিনা শেষ মুহূর্তে। রাজা-রানির মতো চললাম। সারা কামরা ঘুরে ঘুরে নিজেরাই ঠিক করলাম, এটা বেশ আমাদের বেডরুম, এটা ড্রইংরুম। সে কী আনন্দ!

নেতারহাটে নিশিযাপন

বিয়ের পর বন্ধুদের আর বউদের নিয়ে একটা দারুণ গ্রুপ তৈরি হল। হইহই করে একসঙ্গে বেরিয়েছি কত। একবার গেছি নেতারহাট। বন্ধু গৌরবের আবার হানিমুন। হোটেল-ফোটেল আগে থেকে বুক করার ব্যাপারই নেই। সন্ধেবেলা পৌঁছে কিন্তু দেখা গেল, কোনও হোটেলে ঘর নেই। খুঁজে পেতে ডাকবাংলো পাওয়া গেল একটা, টিনের ছাউনি দেওয়া। কুছ পরোয়া নেই। ঢুকে তো পড়লাম। মেঝেতে শোয়ার ব্যবস্থা। কেয়ারটেকার এবার যে বিছানা বার করল, সেটা তেলচিটে বললে কম বলা হয়। মৌয়ের সেসব দিকে নজরই নেই। ও ততক্ষণে কেয়ারটেকারকে দিয়ে চাল ডাল মুরগি আনিয়ে রান্নার তোড়জোড় করছে। রাতে শুতে গিয়ে মনে হল, আরে, গৌরব আর তার বউকে তো আলাদা বিছানা দিতে হবে। হানিমুন বলে কথা! সে না হয় হল, কিন্তু শুয়েই দেখি, টিনের চালে হাজার ফুটো আর সেখান দিয়ে দিব্যি আকাশ দেখা যাচ্ছে। মৌ অবলীলায় বলল, আকাশই যদি দেখব, চলো সবাই মিলে বাইরে বারান্দায় বসি। তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে মৌ খোলা গলায় গান ধরল, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। এমন কতবার যে মৌয়ের সঙ্গে চাঁদের হাসিতে ভেসে গেছি দেশে-বিদেশে।

ব্যাঙাই থেকে ব্যাঙ্কক

মৌয়ের আদি বাড়ি ব্যাঙাই বলে একটা গ্রামে। হুগলি জেলার শেষ গ্রাম। প্রথম আমাদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যাঙ্কক। নেমেই মৌকে খেপাতে শুরু করলাম, এই যে ব্যাঙাই থেকে ব্যাঙ্কক এসেছে। পরে বহুবার থাইল্যান্ড গেছি মৌকে

নিয়ে। কিন্তু একবার একটা সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হল। আমরা যাব ফুকেতে, সঙ্গে আমেরিকা-প্রবাসী দেবাশিসদা আর মুনমুনদি। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে নামলাম, তিন ঘণ্টা পর ফুকেতের ফ্লাইট। মৌ হঠাৎ জেদ ধরল, ফুকেতে যাব না। এখুনি গাড়ি নিয়ে পাটায়া চলো। মৌয়ের খুব প্রিয় জায়গা পাটায়া। কিন্তু তাই বলে এখন ফ্লাইট, হোটেল সব বুকিং নষ্ট করে এই খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হলাম। দেবাশিসদারাও নিশ্চয়ই অখুশি হলেন। যা-ই হোক, মৌয়ের জেদই রইল। আমরা গেলাম পাটায়া। প্রথম দিন কাটল ভালই। দ্বিতীয় দিন ঘুমিয়ে আছি হোটেলের ঘরে। ছুটি কাটাতে গিয়ে বেলা করে উঠব,

সেটাই স্বাভাবিক। উঠে দেখি, প্রচুর মিসড কল। তারপর তো ফোনের বন্যা। ট্রাভেল এজেন্ট তো নিশ্চিত, আমরা আর বেঁচে নেই। সুনামি হয়েছে থাইল্যান্ডে। সব ভেসে গেছে। উনি জানেন আমরা ফুকেত গেছি। সেখানে যে হোটেল বুক করে দিয়েছিলেন, সেটা ঢেউয়ের আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। টিভিতে দেখছে সারা পৃথিবী আর শিউরে উঠছে। রাখে হরি মারে কে! এরকম কতবার যে মৌ বাঁচিয়েছে নিশ্চিত বিপদের মুখ থেকে। কী করে বুঝত কে জানে আগে থেকে!

মরুভূমিতে বৃষ্টি

অবিশ্বাস্য! দুবাইয়ের মরুভূমিতে ঝমঝমে বৃষ্টি ক'জন দেখেছে! আমরা কিন্তু দেখেছি সেই বিরল ঘটনা। কিছুতেই ডেসার্ট সাফারি করতে যাবে না মৌ। গরম সহ্য করতে পারত না। আর দুবাইয়ে মরুভূমির গরম কী সাঙ্ঘাতিক, সবাই জানে। আমি জোরজার করতে লাগলাম। বললাম, তুমি চলো, দেখবে ঠিক বৃষ্টি নামবে। বিশ্বাস কতটা করল কে জানে, তবে রওনা হল। তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল তপ্ত বালিতে। ড্রাইভার পর্যন্ত অবাক। বলল, কত বছর বাদে এমনটা দেখলাম।

ঋষি গেল হারিয়ে

প্রাণের ঋষিকে খুঁজে না পেয়ে মৌয়ের প্রাণটাই যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল সেদিন। বছর তিনেকের ছেলেকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রুজে করে ভিয়েতনামের একটা দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে এই কাণ্ড। মৌ তো হাউ হাউ করে কাঁদছে। আর আমি পাগলের মতো এধার-ওধার খুঁজছি। ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। ক্রুজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি, কয়েকটি ভিয়েতনামি মেয়ে হাসতে হাসতে আসছে, সঙ্গে ঋষি। দিব্যি কথা বলছে, হাসছে, চকোলেট খাচ্ছে। ওরা ওকে একা দেখে বাবা-মায়ের সন্ধানে নিয়ে আসছিল ক্রুজের দিকে। মৌয়ের যেন এতক্ষণ নিঃশ্বাস আটকে ছিল, ঋষিকে পেয়ে বাঁচল। কখনও চোখের আড়াল করত না ছেলেকে।

সুরের দেশে

গানবাজনা চিরকাল পছন্দ মৌয়ের। মোজার্টের দেশে গিয়ে ওকে আর পায় কে! সার্সবুর্গে মোজার্টের বাড়ির সামনে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা। সমুদ্রের বুকে একটা রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছি, দেখি পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটা কটেজের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে মৌ। একসময় বলল, চলো সব ছেড়েছুড়ে এরকম একটা জায়গায় থাকি। সারাদিন মোজার্ট শুনব আর গান গাইব।

রিকশায় ভিয়েনা ভ্রমণ

ভিয়েনা বেড়াতে গিয়ে মৌ পেয়েছিল এক রিকশাওয়ালাকে। সে এমন ফ্যান হয়ে গেল মৌয়ের যে ওকে নিয়ে ঘুরতে লাগল সব জায়গায়। মৌ ভারতীয় খাবার ছাড়া পছন্দ করে না। ওই রিকশাওয়ালা খুঁজে খুঁজে মৌকে নিয়ে যেত ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়। ফিরে আসার পর দেখতাম মৌ ওকে ভোলেনি। মাঝেমধ্যেই

দু'জনের মেসেজ বিনিময় হত। আমি ফোন করে দুঃসংবাদ দিলাম। কী কান্না তার।

পিঠে পড়ল ছত্রি

একটা বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা গেস্ট হাউসে থাকতে দিয়েছিল। মনে আছে, পাশেই খাটে শুয়ে খেলা করছিল একটি বাচ্চা। মৌ গিয়ে ওর কপালে হাত বোলাতে লাগল। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, হঠাৎ খাটের ছত্রি ভেঙে সটান পড়ল মৌয়ের মাথায়। মৌয়ের কতটা আঘাত লাগল, সেটা ভুলে আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, মৌ যদি না উঠে যেত ওকে আদর করতে, ছত্রিটা পড়ত বাচ্চাটার ওপর। আর তাতে যে কী হত, ভেবে শিউরে উঠলাম দু'জনে। এই যে কারও খারাপ কিছু নিজের ভেতর টেনে নেওয়া, মৌয়ের এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আমি বরাবর লক্ষ করেছি। প্রিয়জনের অসুখ হোক কি মনখারাপ, চট করে নিজের ভেতর নিয়ে নিত। কী করে পারত জানি না, কিন্তু বহুবার দেখেছি। ২০০৩ সালে বঙ্গ সম্মেলনে যাব আমেরিকা, সব ঠিক। আমার ডেঙ্গি হল, হাসপাতালে ভর্তি হলাম। দিন নেই রাত নেই, মৌ সেবা করে চলেছে। বাড়ি ফিরলাম। মৌ পড়ল কঠিন অসুখে। ম্যালিগন্যান্সি। আবার লড়াই শুরু ওর। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সারাদিন কাঁদত, আয়নার সামনে দাঁড়াতে চাইত না। ওই যে বলছিলাম, প্রিয় কারও খারাপটা নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মৌয়ের। আজ ভাবি, উল্টোটা হলে ওকে হয়তো যেতে দিতাম না।

হেঁশেল রানি

মৌকে মাঝে মাঝে এই নামে ডাকতাম। কী যে ভালবাসত রান্না করতে। কখনও শুধুই আমার আর ঋষির জন্য, কখনও বাড়িতে বিশেষ অতিথির জন্য, কোমর বেঁধে লেগে গেল চিংড়ির মালাইকারি কিংবা সরষে-ইলিশ রাঁধতে। নিজে মাছ খেত না, কী করে যে এমন অসাধারণ রাঁধত কে জানে! কত লোক যে বলত, তোমার হাতের রান্না খাব। একটুও বিরক্তি নেই, বাজার আনিয়ে রাঁধতে বসে গেল মৌ। মনে আছে, একবার রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এসেছিলেন আজকাল-এর অনুষ্ঠানে। প্রণববাবু ভাত ডাল আলুপোস্ত ছাড়া কিছু খাবেন না। শুনেই মৌ বলল, আমি ওঁর জন্য নিজে হাতে রাঁধব। রান্না করে টিফিন কৌটো করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। শুধু কি বাড়িতে? হোটেলে গিয়েও ঠিক ম্যানেজ করে ঢুকে পড়বে তাদের রান্নাঘরে। তারপর কী ম্যাজিক করে কে জানে নিজের

পছন্দমতো রেসিপিতে তাদের দিয়ে রাঁধাত। জাপানে গিয়ে বলল, এদের এই আধকাঁচা খাবারদাবার মুখে তোলা যায় না। আমি রাঁধব। সুইৎজারল্যান্ডে ঋষির ক্যুলিনারি কলেজে গিয়ে এক্সপার্ট শেফদের শেখাল মাংস রান্না!

শত ভাইয়ের বোন

ভাইফোঁটা ছিল মৌয়ের খুব প্রিয় উৎসব। ভাইয়ের লিস্ট এত লম্বা, বছর বছর যে হারে তা বাড়ে, আমি ঠাট্টা করে বলতাম, সেঞ্চুরি হয়েছে? ভিআইপি থেকে ছোটবেলার বন্ধু, কে নেই! নিজের হাতে সব আয়োজন না করলে শান্তি নেই। কী খাওয়াবে, কী উপহার দেবে, কতদিন আগে থেকে প্ল্যান করত। ভাইফোঁটার দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা বয়সের ভাইদের ভিড়। আজ সেই ভাইদের চোখে জল।

এ তো রাগ নয়, এ যে অভিমান

বড় অভিমানী ছিল মৌ। কথায় কথায় ফর্সা মুখটা, নাকের ডগাটা লালচে হয়ে উঠত। গভীর চোখ দুটো জলে ভরে যেত। এই ছুটন্ত পৃথিবী, এই দুরন্ত জীবনের সময় কই সেদিকে তাকানোর? মৌয়ের কবিতা পড়লেই মনে হয়, এত বেদনা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এত কষ্ট? এত অভিমান? কার ওপর? আমার? জিজ্ঞেস করা হয়নি কোনওদিন।

কিশোরীর সারল্য

মাঝে মাঝে মনে হত, আজকের দিনে সত্যিই কি এমন সরল হতে পারে কোনও মানুষ? লোককে বিশ্বাস করে ঠকা তো মৌয়ের অভ্যেস। আর তারপর এমন রেগে যেত যে, আর তার মুখদর্শন করবে না। আবার হয়তো একদিন সব ভুলে তাকে বুকে টেনে নেবে। মিথ্যে একদম সহ্য করতে পারত না। রাগ, দুঃখের প্রকাশ ছিল ঠিক বাচ্চাদের মতো। আমিও মৌকে ছোট মেয়ের মতো দেখেছি চিরকাল। আসলে সেই যে ১৪ বছরের মৌকে দেখেছিলাম, সেটাই রয়ে গেল মনে চিরকাল। আমি আর কোনওদিন ভাবতেই পারলাম না, মৌ বড় হয়ে গেছে। এখন ভাবি, কত সহজ ছিল মৌয়ের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা। গত বছর কোয়েম্বাটোরে একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। বন্ধু ভাস্করদা ছিল সঙ্গে। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। কাজকর্ম সেরে গেলাম সদগুরুর আশ্রমের আদিযোগী অর্থাৎ বিশাল শিবমূর্তির নিম্নে যেখানে হাজার হাজার ভক্ত উদ্বাহু হয়ে নাচছিল। আমারও যে কী হল, আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে নাচতে লাগলাম। রাতে হোটেলে ফেরার পর ফোন এল ঋষির, মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। আইসিইউ-তে। পরদিনই ফিরে সোজা হাসপাতাল। মৌকে আর বললাম না আশ্রমের কথা। কিছুদিন আগে ইচ্ছে হল ফেসবুকে পোস্ট করি নাচের ছবিটা। মৌ কিন্তু একটুও রাগ করল না। উল্টে বলল, তুমি সেদিন শিববন্দনা করেছিলে বলেই আমি সেযাত্রা বেঁচে গেলাম।

জীবনপুরের পথিক

কম বয়সে আমল দিইনি, প্রায়ই শুনতাম, মৌয়ের শরীর খারাপ। চিঠিতে লিখত আজ জ্বর, কোনওদিন লিখত, চারদিন স্কুল যাইনি। ওইটুকু মেয়ে কেন এরকম অসুস্থ থাকবে, সেটা চিন্তা করার মতো ম্যাচ্যুরিটি ছিল না। চিন্তাটা কিন্তু শেষমেশ হলই যখন মৌয়ের বাড়ি থেকে একদিন খবর এল, মৌয়ের বাড়াবাড়ি রকম শরীর খারাপ। সারা গায়ে রেড স্পট বেরিয়েছে। আমার মেজদা ডাক্তার, তাঁর দুই ইন্টার্ন বন্ধুর ভরসায় মৌকে নিয়ে ট্রেনে করে গেলাম কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে। ওরা ভর্তি করে নিল। সেই ডাঃ বি ডি মুখার্জির সঙ্গে পরিচয়। পরীক্ষা করে দেখা গেল, লিউকোমিয়া। প্লেটলেট নেমে গেল দশ হাজারে। ডাক্তারদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হত, আশা বুঝি নেই আর। ওর নেগেটিভ রক্ত দরকার। সারা রাত ছোটাছুটি শহরের নানা প্রান্তে। শেষমেশ মিলল শ্যামবাজারে। রক্ত তো জোগাড় হল, কিন্তু পকেটে অত পয়সা নেই। কী করব? হাতঘড়িটা খুলে বললাম, দাদা, এটা রাখুন, পরে বাকি টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। রোজ আসতাম হাসপাতালে। বসে থাকতাম বাইরে। ভেতরে মৌ লড়াই করছে।

আজ মনে পড়ছে অত বছর আগে সিএমআরআইতে দাঁড়িয়ে বন্ধু সৌম্যকে বলেছিলাম, 'বিয়ে করলে বোধহয় এত কষ্ট হত না। প্রেমিকা মারা গেলে বেশি কষ্ট, না রে?'

ঠাকুর দেখা

তখন মৌয়ের বেঁচে থাকাটা এতই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে, পুজোর সময় ডাক্তার পারমিশন দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা ঠাকুর দেখিয়ে আনার। ১৭ বছরের ফুটফুটে এক কিশোরীর এটাই হয়তো শেষ পুজো, ভেবেছিল সবাই। মনে পড়ে, দু-চারটে ঠাকুর দেখে সোজা লিন্ডসে স্ট্রিট। বাদশা রেস্টুরেন্টে বসে চাউমিন, চিলি চিকেন খেয়ে আবার হাসপাতাল ফেরত। এটুকুতেই কী খুশি মৌ! ওই বয়সের একটা ছেলে যে কীভাবে বুকের কাছে দলাপাকানো কান্না চেপে মেয়েটার হাত ধরে সেদিন ঘুরেছিল, সে-ই জানে।

মিরাক্‌লের আশায়

মিরাক্‌ল যে ঘটে, বিশ্বাসটা আমার হল মাস দুয়েক বাদে যেদিন মৌকে ছেড়ে দিল। পুরোপুরি খুশি অবশ্য হতে পারলাম না। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির নিয়তির মতো ডাক্তার বললেন, '২৮-৩০ বছরের বেশি কিন্তু আয়ু নয়।' যা-ই হোক, মিরাক্‌ল একবার যখন ঘটেছে, আবারও ঘটবে, এই আশা নিয়ে মৌকে

বাড়ি ফেরালাম।

কিন্তু মৌ একটা কাণ্ড করল। হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিল আমার থেকে। ১৮ বছরের একটা মেয়ে জেদ ধরল, এত অসুস্থ যখন, সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নেই। আমার তো পাগলের মতো অবস্থা। বিবাগী হয়ে খানিকটা বোহেমিয়ান হয়ে গেলাম। '৮৯ সাল। সেদিন ভারত বন্‌ধ। জনা দশেক বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, বাইকে করে কাছেই মন্দিরে যাব রাধাগোবিন্দ দর্শনে। ফুল স্পিডে বাইক ছুটল।

আমার বাইক চালাচ্ছিল বাপি, আমি পিছনে বসে ছিলাম। জি টি রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কী হল, উড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরল নার্সিং হোমে, পাশে বসে মৌ। অত বড় দুর্ঘটনা, অত বিপদ, অত যন্ত্রণার মাঝে শান্তির প্রলেপ, মৌ হাত বোলাচ্ছে আমার কপালে। সেই যে আমার ভাল-মন্দের দায়িত্ব তুলে নিল হাতে, পঁচিশ বছরেরও বেশি কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেনি।

পথ বেঁধে দিল

'৯৪ সালে বিয়ে করলাম। অনেকেই বারণ করেছিল, এমনকী দুই বাড়ির লোকেদেরও সংশয় ছিল। অসুস্থ মেয়েকে কেউ জেনেশুনে বিয়ে করে? আমার একটাই কথা, ভালবেসেছি যাকে, বিয়ে তো তাকেই করব। বিয়েতে খুব জাঁকজমক হল, মফস্‌সলের মানুষ অবাক হয়ে দেখল। মৌয়ের শখ ছিল হানিমুনে জাহাজে করে আন্দামান যাবে। সে-ও গেলাম। শরীর ভাল-মন্দের টানাপোড়েনে মৌয়ের মন খারাপ থাকত, ওকে খুশি রাখতে অনেক জায়গায় ঘুরতাম। কয়েক বছর পর ডাঃ আর এন দত্ত বললেন, মা হলে মৌয়ের শরীর, মন দুই-ই ভাল হবে। হরমোনের পরিবর্তনে মৌ ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু এতখানি ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে? অনেক ভাবনাচিন্তার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। ঋষি এল আমাদের জীবনে একরাশ আনন্দ নিয়ে। তারপর এতগুলো বছরে একের পর এক কত যে বিপদ এসেছে, মৌয়ের শরীরে বোমার মতো আঘাত হেনেছে অসুখ। সহ্যশক্তি অসামান্য। ৫৩ বছরের জীবনে বারবার হাসপাতালে গেছে, কিন্তু প্রতিবারই যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে। এর মধ্যেই সংসার, ছেলেকে মানুষ করা, আমার আর পরিবারের দেখভাল, অফিসের কাজ— কোনটা না করেছে! মুখ থেকে কথা সরতে না সরতে হাজির সবকিছু। যেন জাদুকর। সামান্য চেনা কেউ সাহায্য চেয়েছে, সারাদিন ধরে ফোন করছে কোথায় ডাক্তার, কোথায় হাসপাতাল। একদিকে নিজের ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ, অপারেশন

আর অন্যদিকে আত্মীয়-বন্ধুদের জড়িয়ে বাঁচা, কাজের জগতের অনেক দায়িত্ব, দেশ-বিদেশ বেড়ানো— সব মিলিয়ে মৌয়ের জীবনের নকশিকাঁথা বোনা হতে লাগল নিজস্ব রঙে।

না বলা বাণীর ঘনযামিনী

শূন্য ঘরে বসে ভাবি, কত কথা বলার ছিল মৌয়ের। কত ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে গেল। আমারও। মৌ কাশ্মীর যেতে চেয়েছিল টিউলিপ দেখবে বলে। হল না। তখন বললাম, ৫ মে আমি লন্ডন যাচ্ছি কাজে। ১০ তারিখ শেষ হয়ে যাবে কাজ। ১১ তারিখ চলে এসো আমস্টারডাম। তোমাকে নিয়ে টিউলিপ গার্ডেন দেখব। সে আর হল কই? এখন কিন্তু মৌ আছে ওর প্রিয় টিউলিপের মাঝখানে। জেনে, না-জেনে কত মানুষ যে টিউলিপ পাঠিয়েছেন মৌকে!

এই তো সেদিন বেনারস যেতে চাইল। টিকিট কাটা হল। কিন্তু হোটেল নিয়ে সমস্যা। ক্যানসেল করে পুরী গেলাম। এবার অবশ্য মৌকে নিয়ে বেনারস যাব। ওর চিতাভস্ম রেখে দিয়েছি। গঙ্গায় ভেসে চলে যাবে কত দূরে কে জানে! আর আমি? সারাজীবন ডুবতে রাজি আছি মৌয়ের হাত ধরে। যে হাত ছেড়ে দিয়েছিল ৭ মে, হাসপাতালে, ও জানে না, সে হাত আসলে ধরে রেখেছি শক্ত করে। যাওয়া তো নয় যাওয়া।

লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে এল

পারুল রায়চৌধুরী

এক বৃহস্পতিবারে এসেছিল আমার ঘরে। বিয়ের পরদিন গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে 'মা' বলে জড়িয়ে ধরল। তার আগে তো জেঠিমা ডাকত, যেমন ডাকে ওই বয়সের চেনা মেয়েরা। সেই যে মা হলাম, কোনও দিন শাশুড়ি ভাবেনি। বলত, আমার দুটো মা। আর শুধু আমার ঘর আলো করে সুন্দরী বউ এল তা নয়, লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে এল। মৌ আসার পর আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়তে লাগল।

মৌ-কে আমার মনে হত নারকেলের মতো, বাইরে শক্ত, ভেতরে নরম। এমন দয়ামায়া সবার জন্য, কী বলব। স্নান-খাওয়ায় দেরি করলে বকুনি দিত। আবার খেতে বসে নিজে না খেয়ে রুটি ছিঁড়ে রসগোল্লা দিয়ে মুখে ধরত, 'মা, তুমি মিষ্টি ভালবাসো, খাও।' হুগলির বাড়িতে থাকতে গেলেই ফোন, 'মা, চলে এসো, কী দরকার একা থাকার?' ক'দিন পরপরই আসি সত্যম-মৌয়ের কাছে, সল্টলেকের বাড়িতে। অনেক দিন করে থাকা হয়।

আমাদের হুগলির বাড়িতে বরাবর সরস্বতী পুজো আর ভাইফোঁটা হয় খুব বড় করে। লোকারণ্য একেবারে। সবাইকে আপ্যায়ন, কে কী খাবে, মৌ-এর ব্যস্ততা কত! লোকের জন্য করতে খুব ভালবাসত। এখন সে বাড়ি শূন্য।

কত আনন্দের মুহূর্ত কাটিয়েছি। একসঙ্গে বেড়াতে গেছি পুরী, দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন, বাংলাদেশ। নাতি ঋষি হল, আমার কাছেই ছিল, আনন্দের বন্যা। আজ আমার শূন্য হাত, খালি খাঁচা। কী নিয়ে বাঁচব?

এমনি করেই দিন কেটে যায়
রাত যায় যে এসে,
এবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো
তুমি বলো হেসে।
হামি দিয়ে কপালেতে
নিভিয়ে দিলে আলো,
জড়িয়ে ধরে বলি, মাম
সবচেয়ে তুমি ভালো।

— মৌ রায়চৌধুরীর লেখা 'ঋষির রুটিন' কবিতার অংশবিশেষ

A Maternal Friend

Sohini Debnath

Aunty was like a maternal friend, with whom I could share my deepest thoughts with graceful ease. I cherish the closeness we shared, the secrets comfortably exchanged. Her warm smile transformed any space into a welcoming home, and her kindness and boundless love left a lasting imprint on me. Yet, there is a poignant longing for what might have been—how our relationship could have flourished, the myriad of experiences we could have shared. These will now dwell only in the realm of my imagination. Despite the aching sense of loss, I am profoundly grateful to have known her and to have shared moments that many yearn to experience with their mothers during their twenties. These experiences are precisely why I called her a maternal friend. In your twenties, you often seek a friend in your mother, and she gave me more than just glimpses of that cherished bond.

৩ মাস আমাকে বকেনি...

সুমন্ত চ্যাটার্জি

অনেক ছোটবেলায় একবার আমার আর দিদিভাইয়ের সামনে দাদু বলছিল, বট গাছের নীচে সবাই আশ্রয় চায়, বটগাছ কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, অভিমানও করে না। আমি তখন ৬ কিংবা ৭ বছর, আর দিদিভাই ১৬ কিংবা ১৭। দাদু কথা বলছিল, আর আমি তালে ছিলাম কখন দাদুর থেকে ১ টাকার কয়েন নিয়ে ঘুড়ি আর বাসনা বিস্কুট কিনতে যাব। দিদিভাই হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, দাঁড়া, দাদু কী বলছে আগে শোন। আমি পালিয়েছিলাম খেলব বলে।

ছোটবেলায় বাবাই–এর আলমারি থেকে লুকিয়ে টাকা নিয়ে লোককে বই কিনে দিত, পুজোয় দরিদ্রদের জামা কাপড় কিনে দিত। আমি দেখতাম আর ভাবতাম, বাবাই কী বুঝতে পারে না দিদিভাই টাকা নিচ্ছে! একদিন মা বুঝতে পেরে বাবাইকে বলছিল। তখন খেলাধুলো সেরে সবে আমার ঘরে ঢুকছি। শুনি, বাবাই মা কে বলছে, মৌ কেন টাকা নেয় আমি জানি। তুমিও তো শুনেছ। ওকে কিছু বলতে হবে না।

এখন ভাবি মাঝেমধ্যে, এই কথাগুলো দাদা–দিদিভাই দুজনের এক হবার মূল কারণ। এরা দুজনেই বট গাছের মত। সবাই হয়তো অনেক কিছু দেখেছে, ভেবেছে, কিন্তু দুটো ভাল মানুষের মধ্যে ভালবাসা সব সময় হয়েই যায়। দুটো প্রিয় মানুষ, অন্য প্রিয়-অপ্রিয় সকল মানুষের স্নেহ, ভালবাসা একসঙ্গে করার মানসিকতাটাই হয়তো দিদিভাইদের কাছে এনেছিল ।

বিগত ৩ মাস ও আমাকে বকেনি। কোনও বিষয়ে ভুল করলে চুপ করে যাচ্ছিল। হাসপাতালে যাওয়ার সময় ওর হাত ধরাটা এত আলগা ছিল যে আমি ভেবেছিলাম ব্যথার জন্য। এখন বুঝতে পারছি সেটা নয় ।

শ্বশুরবাড়িতে অফুরন্ত মাতৃস্নেহ

রেশমী কুণ্ডু চ্যাটার্জি

দিদিভাই। প্রথম দেখা ২৩ আগস্ট, ২০১৯। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পুজোয় বসে সঙ্কল্প করছিল। আমি এফই ৪০১-এর সিঁড়ি দিয়ে টুয়ার সঙ্গে উঠছি। আমাকে দেখে এমন ভাবে হাসল, মনে হল যেন কতদিনের চেনা। অনেকদিন পর আমাকে দেখে খুব আনন্দ পেয়েছে।

তারপর, ননদ-ভাজের সম্পর্ক কোনও দিন অনুভব করতে পারিনি। শ্বশুরবাড়িতে অফুরন্ত মাতৃস্নেহ যদি পেয়ে থাকি, সেটা দিদিভাইয়ের থেকে। যে কয়েকবার বকুনি খেয়েছি, প্রত্যেকবার অন্যের ভুলের মাশুল দিয়েছি। চুপ করে শুনে নিয়েছি। মনখারাপ হয়েছে অবশ্যই। তবে আবার যখন বুঝিয়ে বলেছি, তখন বুঝেছে সেই বকুনি আমার প্রাপ্য ছিল না। ঠিক সেই কারণেই কোনও দিন আমার সঙ্গে মতের অমিল হয়নি। বরং একটা সময় পর, আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। কারণ, বুঝে গিয়েছিলাম, দিদিভাই বুঝবে। দিদিভাই-ই বুঝবে। যেটা আর কেউ বোঝেনি। বুঝবে না।

ছোটবেলা থেকে শরীর খারাপে মা যত্ন করেছে, এটা এমন কী আর আশ্চর্যের! জ্ঞানত তা-ই হয়েছে, সেটা আশাতীত নয়। তবে বিয়ের পর যখন শরীরটা কোনও কারণে খারাপ হয়েছে, একটা ফোন করে, কী খাব, কোন্ জিনিসটা ইচ্ছে করছে খেতে, কেউ জানতে চায়নি। এই তিন মাস আগে জ্বর হল যখন, 'মুখে তো রুচি নেই তোর, কিন্তু খেতে হবে। প্রতিদিন একটা করে ডাব অবশ্যই খাবি। এখন একটু স্যুপ খাবি? সঙ্গে ঝাল ঝাল চিলি চিকেন দিয়ে? মুখটা ছাড়বে। চিকেনটাও খাওয়া হবে। খাবি?' ততদিনে আমি জানি এটাই দিদিভাই। আমি তো এই আচরণে অভ্যস্ত। আজ ভাবছি, কে বলবে এটা? কথাগুলো কানে বাজছে। যেটা আমি আশা করেছিলাম পাপান করবে, কোনওদিনই করেনি। সেটা দিদিভাই করেছে। কথাগুলো কানে বাজছে।

এই ভালবাসা মাত্র ৪ বছর ৮ মাসে ফুরিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। এইটুকুই কি প্রাপ্য ছিল?

আমার মেয়ে, রাজলক্ষ্মী, ওর কি এরকম একজন মানুষের ভালবাসা শুধুই ১ বছর ৫ মাস পাওয়া ছিল? ওর কিছু বোঝার আগেই ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল?

হয়তো তা-ই ছিল। সবই ললাটের লিখন।

কোথাও তো নিশ্চয়ই আছে দিদিভাই। দেখতে পাব না, শুনতে পাব না, একটু স্পর্শ করতে পারব না। কথা বলা হবে না। আড্ডা হবে না, গাড়ির মধ্যে বসে আইসক্রিম, চপ-মুড়ি খাওয়া হবে না, বইমেলার স্টলে বসে ফিশ ফ্রাই খাওয়া হবে না, কত রান্নার রেসিপি জানা হবে না... অনেক কিছুই হবে না, তবু যোগাযোগটা থাকবেই। সেটা একান্ত আপন আত্মিক।

পিসির সঙ্গে আদরের রাজলক্ষ্মী

আর কোনও মিরাক্‌ল হতে পারে না?

গীতা বসু

সালটা ১৯৮৪ বা ১৯৮৫। একটা মেয়ে, তার মায়ের হাত ধরে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। কেন? আমার কাছে সে পড়বে। আমি তখন টিউশন পড়াই। তার পরনে লাল জামা, আকাশি রঙের স্কার্ট। বড় বড় দুই চোখ। এসেই মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, মনে হয়েছিল খুব কাছের, আপন। কেন মনে হয়েছিল সেদিন বুঝতে পারিনি। পরে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর বুঝেছিলাম, সব আসলে ঈশ্বর-নির্ধারিত।

আমার কাছে মৌ পড়তে ঢুকল স্কুলে পড়ার সময়। বেরোল কলেজ শেষ করে। মৌ আমার খুব কাছের ছিল। ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের পর আমরা পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। সত্যি বলতে, মৌ ছিল আমাদের পারিবারের মাথার ছাতা। প্রত্যেককে একে অপরের সঙ্গে বেঁধে রাখার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল। কীভাবে করত কে জানে! আমাদের কারও পক্ষে এটা সম্ভব নয়। সবকিছু এত নিখুঁত ভাবে ম্যানেজ করত, আমি মাঝে মাঝেই বলতাম, ম্যানেজমেন্ট না পড়েও ফার্স্ট ক্লাস। ও কেবল হাসত।

মৌ কিন্তু আমাকে কাকিমা বলে ডাকত। সেই ছোট থেকে। এক বন্ধুর সূত্রে সেই যে কাকিমা ডাকা শুরু করল, বিয়ের পর জানিয়ে দিল, আমাকে কাকিমা বলেই ডাকবে। এত বছরের সম্পর্কে আমি ওর থেকে শুধু সম্মান-শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পেয়েছি। এখন এক-একটা ঘটনা মনে পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মৌ যখন আমার কাছে পড়ত, তখন আমার মেয়ে হয়। আমার মেয়ের সাজগোজ থেকে ঘোরা-বেড়ানো, জন্মদিন— সব নিজে দায়িত্ব নিয়ে করেছে। আমার মেয়েই ওকে মৌসুমি থেকে মৌ নামে ডাকতে শুরু করে। কত স্মৃতি ভিড় করে আসছে। মনে পড়ছে, আমাদের ২৫ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে কী ধুমধাম আয়োজন! আমি তো অবাক! হঠাৎ করেই বলত তৈরি থাকতে। কেন? ঘুরতে যাব। আমার হাতের ডিম-ডাল আর ঘুগনি খেতে মৌ বড় ভালবাসত। হুগলি যাওয়ার আগে মেসেজ করত। কলকাতায় নিয়ে আসত। কয়েকদিন ধরে ওটাই খেত। আর ছবি তুলে পাঠাত।

২৯ এপ্রিল ওকে মেসেজ করলাম, ‘শরীর কেমন আছে।’ ১ মে রিপ্লাই দিল। সেদিন আমাদের বিবাহবার্ষিকী। মৌ লিখল, ‘ভাল আছি কাকিমা। আপনারা আমাদের প্রণাম নেবেন।’ এটাই আমার কাছে মৌ-এর শেষ মেসেজ। ওটাই কি শেষ প্রমাণ করে গেল? এখন কি আর কোনও মিরাক্‌ল হতে পারে না?

মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে, তাই কোরো দিদি

ভাস্কর গুপ্ত

রাখি পূর্ণিমা, সকালে উঠেই ফোন করতাম। কখন যাব? রুম রেগে যেত। বলত, ‘মেয়েটাকে রেডি হতে দাও।’

প্রথম রাখি পরা ওর হাতেই। তাই উত্তেজনাও বেশি। আমার তরফ থেকে উপহার খুবই সামান্য। বলতাম, ‘ফুচকা খাবে?’ ওটাই ও চাইত। একগাল হেসে বলত, ‘এত সারা বছরের ফুচকা পার্টি!’

বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট। তবুও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করত।

তাই কোরো দিদি...

ফিরে আয়

মহুয়া গুপ্ত

তোকে কোনওদিন কিছু লিখিনি। যা বলতাম তা মুখেই। আজ লিখতে ইচ্ছে করছে, ‘ফিরে আয়’। তোর প্রয়োজনীয়তা কতটা বুঝতে দিসনি। আজ বুঝছি। মুখে বলতে পারিনি, তুইও আমার, পাপানের মা।

পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে

কেউ ডাকবে না ‘রিকু’ বলে

স্পন্দন গুপ্ত

আমার মাইয়া।
বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘মা মাইয়া মানে কী?’
মা বলেছিল, ‘মাইয়া মানে মা।’
বলেছিলাম, ‘আমার দুটো মা?’
মা বলল, ‘মাইয়া আমারও মা।’
‘রিকু রাতে বিরিয়ানি...’, ডাক পড়ত। সেদিনও বলল, ‘কবে আসবি? বিরিয়ানি পার্টি হবে।’ সবার হাতে আইফোন। জন্মদিনে আইফোন পেলাম। জানি না কী করে বুঝত। আবদার করার আগেই সব পেয়ে যেতাম। ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে, মাইয়াকে একটা ফোন কিনে দেব। আরও কিছু। হল না। তাকেই আর দেখতে পাব না। এই আফসোস থেকেই গেল।
আমি মাইয়ার ‘রিকু’। আর কেউ ডাকবে না ‘রিকু’ বলে।

Srijan Roychowdhury
(Rivu)

In loving memory of my dear Mummy, I write,
A heart full of gratitude, a soul taking flight.
With a smile that lit even the darkest of days,
You showed us love in so many ways.

As Mummy, you were a mother to me,
Caring, comforting, so tenderly.
In every heart, your presence remains,
But in mine, forever, your love sustains.

Through tough times, you stood so tall,
Keeping us together, through it all.

Though you've left, your spirit lives on,
In every sunrise, in every dawn.
In my heart, you'll forever stay,
In your memory, I’ll find my way.

কথা দিচ্ছি, বড় দাদা হিসেবে তোমার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাব

গৌতম রায়চৌধুরী

মৌ রায়চৌধুরী, আমাদের সবার প্রিয় মৌ। রায়চৌধুরী পরিবারের ছোটবউ। আমার ভাই সত্যমের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী এবং আমার বোন। ছোট ভাইয়ের বউ হিসেবে কখনও দেখিনি তোমাকে। নিজের ছোট বোনের মতো দেখার চেষ্টা করেছি। আজ এইভাবে তোমাকে স্মরণ করতে হবে কোনও দিন ভাবিনি। খুব তাড়া ছিল কি মৌ? জানি না। বেশ রাগ হচ্ছে। কারণ তোমার যাওয়াটা অসময়োচিত। আচ্ছা তুমিই বলো, ৫৩ বছরটা কি যাওয়ার ছিল? কত কাজ পড়ে আছে বলো তো। অবিবেচকের মতো কাজ করলে তুমি।

তোমার সাধের ঋষি বা সত্যম অথবা আমরা কিংবা এই যে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ–এর মতো একটা বড় পরিবার কী দোষ করল যে, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে? তোমার কাজগুলোর কী হবে? এত বছর ধরে তোমার মানুষের সঙ্গে চলা, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা, বিবিধ কাজে নিজেকে যুক্ত করে চলা তোমার আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে এখন আমাদের চলতে হবে, তবে তোমাকে ছাড়া।

তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বড় দাদা হিসেবে তোমার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুঃখ এই যে, অনেক দূর থেকে তুমি দেখবে তোমার সাধের সংসার, কিন্তু আমাদের তোমাকে আর ফিরে দেখার উপায় নেই মৌ। না গেলেই পারতে।

না জানি এতক্ষণে, কোটি আলোকবর্ষ দূরে
কোথায় আছো কেউ জানি না আর।
জানি শুধু রইল পড়ে ভালবাসার স্মৃতি

মনকে তাই শক্ত করে বাঁধছি এখন সবাই বসে
ফিরবে না আর তুমি জেনে, দুষছি এখন দেবতারে
এ কেমন তার অদ্ভুত এক নীতি।

Dreams Woven Together

Manoshi Roychowdhury

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

Memories of our shared laughter, secrets whispered, and dreams woven together flood the mind, each one a bittersweet reminder of Mou's absence. Didibhai, the way she called me can never be heard again, leaving behind an ache that feels impossible to heal. Yet, in the midst of grief, there is solace in the love and memories she left behind. She may be gone, but her spirit lives on in the moments we shared and the bond we had. I shall continue to fulfil those dreams we dreamt together and life will not remain the same anymore... For every occasion my eyes will search for you, knowing that your presence will continue to inspire me. The heaven is lightened up with a star like her and may her soul find eternal peace and light.

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে

In loving memory of Chhoto Kamma

Meghdut Roychowdhury

Chhoto Kamma, a beacon of warmth and wisdom, departed from us far too soon, leaving behind a legacy of love and kindness that will forever resonate in the hearts of those she touched. A cinephile at heart, Chhoto Kamma found joy and solace in the world of films, her spirit dancing in the flickering lights of the cinema. Her profound admiration for Rabindranath Tagore enriched her soul and infused her conversations with poetic elegance, making every interaction with her a beautiful verse in the great poem of life.

Chhoto Kamma's kitchen was a haven of comfort; the aromas of her cooking would wrap you in warmth, making you feel cherished and at home. She nurtured not just with food, but with her enduring compassion, always ready to lend an ear or a healing touch, embodying the love and care of a true healer.

Today, as we remember Chhoto Kamma, we celebrate her extraordinary life—a life dedicated to the happiness and well-being of others. Her untimely departure leaves an irreplaceable void in our lives, but her memories will continue to inspire us. Let us honor her by embracing the qualities she embodied: generosity, love, and a zest for life that knew no bounds.

Farewell, dear Chhoto Kamma, your story will continue to be told with affection and admiration, echoing through the ages as a testament to a life beautifully lived.

তোমার আরব্ধ কর্ম আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব

ডাঃ উত্তম রায়চৌধুরী ও ডাঃ সুমিত্রা রায়চৌধুরী

মানুষ মরণশীল। এই নশ্বর দেহ একদিন শেষ হয়। কিন্তু এ তো অকাল প্রয়াণ। এ বড় বেদনার। যাদের রেখে গেলে, তাদের প্রতি পল যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো। দুর্বিষহ বেদনায় ঢাকা পড়ে গেল। এ বেদনার ভার সইতে পারা বড় কঠিন। তবু মেনে নিতে হবে। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত এই পরমাগতি মৃত্যুর উপর হাত নেই মানুষের। তাই আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে তুমি অকালে ঝরে গেলে। পিছনে রইল তোমার উজ্জ্বল কর্মময় জীবন, তোমার অজস্র কীর্তি, তোমার ধারাবাহিক সফল মনস্কামনা। তোমার আরব্ধ কর্ম আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। বিষণ্ণ প্রাণের বাসরে এইটুকু অঙ্গীকার আমাদের। কর্মের প্রতি অবিচল আস্থা, নিয়মের নিগড়ে বাঁধা জীবন তোমাকে পৌঁছে দিয়েছে কীর্তির শিখরে। জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের প্রতি কর্তব্যবোধ, এসব ছিল তোমার কাছে শিক্ষণীয়। তোমার সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল মানুষের প্রতি এক অবিচল মমত্ববোধ, এক জাগ্রত চেতনার মূর্ত প্রতীক ছিলে তুমি। আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরন্তন সত্যের মতো ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবে তুমি অনন্তকাল জুড়ে। পরিবার ও সমাজের কাছে তুমি ছিলে আদর্শ। যে চেতনাচৈতন্য বোধে মানুষ অমরত্ব লাভ করে তার সবটুকু গুণ তুমি অধিকার করে, বিস্তৃত করেছ এক বিদগ্ধ সাম্রাজ্য। মেধা আর মননের মিশ্রিত ভাবনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক বিপুল ঐশ্বর্য্যরাজি। সাহিত্যের অঙ্গনে চর্চা করেছিলে, নান্দনিক সৌন্দর্যের এক বিপুল সম্ভার। তন্নিষ্ঠ হৃদয়জুড়ে ছিল সৃষ্টির নব নব উন্মেষ। সৃজনশীলতায় তোমার সুদৃঢ় পদচারণায় ঋদ্ধ হয়েছে সুধী সমাজ, তোমার পরিবার, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী পরিজনেরা। আকাশের গায়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আলোকশিখা বিকীর্ণ কর। যে শিখার দীপ্ত আলোকে আমাদের তৃপ্ত করেছ এতকাল, সেই আলোকশিখা বিকীরণ কর জন্মজন্মান্তর ধরে।

তোমার এই অকাল প্রয়াণে আমাদের হৃদয়জুড়ে শুধুই এক শূন্যতা, যা পূরণ হবার নয়।

‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে...’

ওম্ শান্তি ওম্ শান্তি ওম্ শান্তি।

রায়চৌধুরী পরিবারের সরস্বতী পুজো

পরিবার তাঁর প্রাণ

বাবা-মায়ের সঙ্গে

অনেক কিছুর জন্য ঋণী থাকলাম

তিথি বিশ্বাস

আমি সত্যমের বড় মাইমা অর্থাৎ মৌসুমীর শাশুড়ি। হ্যাঁ, আমি ওকে পুরো নামেই ডাকতাম। কিন্তু মনে হত, ওই আমার শাশুড়ি। সবরকম ব্যাপারেই মৌসুমীর পরামর্শ নেওয়াটা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিপদের দিনে, দুঃখের সময়ে, ওকে পাশে পেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, একজন অভিভাবককে হারালাম। কারো সঙ্গে আলাপ করালে কোনওদিন শুনিনি সত্যমের মাইমা, বলত, ইনি বড় মাইমা। অনেক কিছুর জন্য ওর কাছে ঋণী থাকলাম।

মৌসুমী, তুমি যেখানেই থাকো ভাল থাকো। কেনো জানি না, মনে হচ্ছে তুমি আমাদের সবার মধ্যেই আছ। এই বলে উঠবে, 'মাইমা কিসে ফিরবেন? গাড়ি আছে তো?'

তোমরা খেয়েছ তো? দিদির মতো খোঁজ নিতেন ম্যাডাম

মৌ রায়চৌধুরী। কর্মক্ষেত্রে তিনি 'ম্যাডাম' বলে পরিচিত হলেও, আসলে অভিভাবকের মতো আগলে রাখতেন অনেক বড় একটা পরিবারকে। গৃহসহায়িকা থেকে গাড়ির চালক, সবার খোঁজখবর নিতেন মনে করে। মৌ রায়চৌধুরীর প্রয়াণে তাঁরা কেউ হারিয়েছেন বউদিকে, কেউ দিদির মতো 'ম্যাডাম'কে।

প্রায় ১৮ বছর মৌ রায়চৌধুরীর গৃহসহায়িকা হিসেবে কাজ করেছেন হয়রানি। বউদি নেই, এটা মানতেই পারছেন না। বারবার বলছেন, 'ওঁর মতো ভাল মানুষ একটাও নেই পৃথিবীতে। তবে রাগ ছিল একটু। আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। সবার দেখাশোনা করতেন, ভালবাসতেন। এরকম একজন ভাল মানুষ চলে গেলেন।'

রায়চৌধুরী বাড়ির গৃহসহায়িকা তারা। বউদির কথা খুব মনে পড়ছে। বকুনি-অভিমানের কথা মনে পড়ছে। বললেন, 'মাঝে মাঝে বকুনি দিলে বলতাম চলে যাব। বউদি বলত, দেখি, কেমন করে যাস আমাদের ছেড়ে।

কোনও কাজ ভুলে গিয়েছি শুনলে অভিমান করে বলত, আমার কথা কেন শুনবি? ভুলে যাবিই তো। দাদার কথা শুনবি কেবল। কাজটা করে রেখেছি শুনেই সেই একগাল হাসি।'

সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে গেলেই খোঁজ পড়ত বুবাইয়ের। ম্যাডাম-এর কথা মনে পড়ছে তাঁর। মনে পড়ছে কড়া কফি আর মুড়ি-মাখার কথা। ম্যাডাম-এর মুড়ি-মাখা কেমন? তাতে ঝাল কম, আলু-টম্যাটো বাদ, কেবল ছোলা-বাদাম। তিনি অফিসে গেলেই তৈরি রাখতে হত ঠান্ডা জল। ওঁর ভারী ব্যাগ নিতে চাইলে, দিতেন না। নিজেই বয়ে নিয়ে যেতেন। সকলকে বলতেন, 'তোরা আগে খা।' কর্পূরের গন্ধ বড় প্রিয় ম্যাডাম-এর। বুবাইয়ের মনে ভিড় করে আসছে সেসব কথা।

২০০৪-এ সল্টলেকে এফ ই ৪০১-এর বাড়িতে এসেছিলেন ফেলু। সেদিন প্রথম দেখেন 'স্যর', 'ম্যাডাম'কে। অনেক বছর ম্যাডাম-এর গাড়ি চালিয়েছেন। তাঁর কাছে 'ছেলে'র মতো ছিলেন। ম্যাডামকে মানতেন 'শিক্ষক' হিসেবে। জীবনে চলার পথে নানা সময়ে ভুল শুধরে দিয়েছেন। বাইরে নিয়ে গেলে বারবার জিজ্ঞেস করতেন, খাওয়া হয়েছে কি না। শোকাতুর গলায় ফেলু বললেন, 'যাঁর কাছে এত শিখেছি, তিনি দূরে চলে গেলেন। যতদিন বাঁচব, তাঁর কথা মেনেই চলব। সঠিক পথে চলব। ম্যাডাম আমার মনের মধ্যে বেঁচে থাকবেন চিরদিন।'

বাসু, নায়েক দু'জনেই ম্যাডাম-এর গাড়ি চালিয়েছেন। নিয়ে গিয়েছেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। ম্যাডাম-কে ২৬ বছর ধরে দেখছেন বাসু। এখনও তাঁর মনে পড়ছে চাকরির প্রথম দিনের কথা। তখন তাঁর বয়স ২০। মনে পড়ছে, কোনও অনুষ্ঠান কিংবা বাড়িতে কোনও বিশেষ রান্না হলে মনে করে দিতেন বাসুকে। একেবারে 'নিজের দিদি'র মতো। বলছেন, 'বকুনি দিতেন। তবে এত ভালবাসতেন যে, বকুনি কিছু মনেই হত না।' নায়েকও এখনও মানতে পারছেন না, ৮ বছর ধরে যে ম্যাডাম-কে তিনি চেনেন, তিনি আর নেই। কিছু বলতে হবে তাঁকে নিয়ে, ভাবতে পারছেন না সেটাও।

আজকাল-এর অফিসের আদি। ২০১৪ থেকে ম্যাডাম-কে দেখছেন তিনি। আদি তখন ক্যান্টিন চালাতেন। ম্যাডাম এলেই ডাক পড়ত ডিমের চপ, ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য। ম্যাডাম নেই, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর। বলছেন, 'ম্যাডাম মানুষ বড় ভাল ছিলেন। সব স্টাফের খবরাখবর রাখতেন। আমাকেও স্নেহ করতেন। ছ'মাস আগেও বললেন আবার ক্যান্টিনে ফিরে যেতে। বলেছিলেন সবরকম সাহায্য করবেন। সে আর হল না...'

আজকাল-এ চা বলতে চেনা মুখ কার্তিক। তাঁর মনে পড়ছে একটা দিনের কথা। বলছেন, 'এক কাপ চা আর বিস্কুট খেয়ে খুশি হয়ে ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন। এমন মানুষ হয় শুনেছেন!' কার্তিকের চা ভালবাসতেন 'ম্যাডাম', সঙ্গে বাদাম-বিস্কুট। আর কি কেউ ডাক পাঠাবে, চা আর বাদাম-বিস্কুটের জন্য? খাওয়ার পর তৃপ্তি করে বলবে, 'আহা! কী ভাল।'

‘দাদা’ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

মারাদোনার সঙ্গে ফ্যানগার্ল

প্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং-এর সঙ্গে

‘কাকু-কাকিমা’ মান্না দে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে